কুড়ি কিলোর আতঙ্ক

সুদীপ্তা রেমী

বিদেশ থেকে যারা দেশে আসেন তারা সবাই জানেন এই আতঙ্কের কথা। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে যারা তাদের আপনজনদের দূরে রেখে কর্মখাতিরে নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে বসবাস করছেন তাদের কাছে দেশে যাবার আনন্দটাই মাটি হয়ে যায় এই কুড়ি কিলোর টাল সামলাতে। আমেরিকা তো সব দেশের বড়দাদা, তাই সেই দেশের অধিবাসী তথা নাগরিকদের একটা হিসেব করে দেওয়া হয়েছে তাদের লাটবহরের, দুটো স্যুটকেশ সে যত বড়ই হোক, ৭০ কিলো পর্য্যন্ত কোন কথাই বলবে না এয়ারপোর্টে, এর বেশী হলে অবশ্য উঁচু হারে ডলার নিয়ে নেয়। কিন্তু যারা ইউরোপবাসী তাদের লাগেজ কোটা ঐ ২০ কিলো। জানাশোনা এয়ার লাইন হলে একটু অবশ্য কন্সিডার করে। কিন্তু সেই সব উড়োজাহাজগুলো বহু-বন্দরে থেমে থেমে আসে বলে প্রায়ই বাক্স খোয়া যায়। 'হায়' 'হায়' করা ছাড়া কোন উপায় নেই কারণ সেই সব গরীব কোম্পানীগুলি একটা খুব ছোট পরিমাপের ডলার অফার করে তাদের দায়িত্ব ছাড়ে। তাই যাত্রীদের জন্য দুটো পথ খোলা-হয় বেশী পয়সার টিকেট কাট, জিনিসপত্রের ইন্সিওরেন্স নিয়ে, নয়ত জিনিষ খোয়া যাবার রিস্ক বা ঝুঁকি নাও।

২০ কিলোর আতঙ্ক তাদের জন্যই যাদের অনেক আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব থাকে। তাদের জন্য বিদেশী ছোটখাটো প্রয়োজনীয় জিনিষ, খেলনা, খাবার জিনিষ, চকোলেট, ড্রেস ইত্যাদি নিয়ে তাদের খুশী রাখতে আমাদের সকলেরই ইচ্ছে থাকে। যদিও এখন আমাদের দেশে বহু বিদেশী জিনিষের রমরমা বাজার। ধনী ছেলেমেয়েরা তো বিভিন্ন বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করার রীতিমত অভ্যাস করে ফেলেছে। দামটার থেকেও সেই জিনিষের মার্কটা ওদের কাছে বেশী প্রয়োজনীয়। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায়, বহুরকম উড়োজাহাজের সমারোহে এখন বিদেশে বেড়াতে যাওয়াটা কোন ব্যাপারই না। আগে সিনেমার শিল্পীরাই সুটিং করতে ঘন ঘন বিদেশে আসতো, আমরা সিনেমার মধ্যেই বিদেশের পরিচ্ছন্ন শহর, পর্বত-প্রকৃতির দৃশ্য দেখতাম আর স্বপ্ন দেখতাম সেই সব মনোরম প্রকৃতির দেশের। এখনকার যুগে আমাদের অনেকেরই সৌভাগ্য হয়েছে সে-সব দেশ দেখার, সে সব দেশে বাস করার। কারো পড়াশুনার খাতিরে, কারো কর্মের খাতিরে। কিন্তু আমাদের কাছে, 'সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।' তাই মনটা সারাক্ষণ আঁকুপাকু করে দেশের পরিজনদের জন্য এবং তাই সুযোগ-সময় পেলেই আমরা ছুটে আসি আমাদের জন্মভূমি মায়ের কোলে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের খুঁজে পেয়ে, 'আহা, কি আনন্দে' গা ভাসিয়ে দিই। ভাই-বোনেরা কত আদর যত্ন করে তাদের 'পরবাসী' আপনজনের। ছোটখাটো উপহার পেয়ে কত খুশী হয়, আবার যখন 'দামের' কথা জেনে যায় তখন ওদের চক্ষু 'চড়কগাছ' হয়ে পড়ে কারন দেশের টাকার মূল্য বিদেশী ইউরোর কাছে বহুগুন তফাৎ ! আমার এক ভাই তো প্রতি বছর আমাকে বকে ধুয়ে দেয় এ সব 'ফালতু' খরচ করার জন্য। বৌ-রা অবশ্য খুব খুশী ওদের উপহার পেয়ে। কিন্তু এইসব সামান্য উপহারগুলো যখন ওজনের কাঁটাটা বাড়ায় তখনই বুকটা ধ্বক করে ওঠে একটা চিন্তায় : পার করতে পারবো তো স্যুটকেশটা বিনা জরিমানায় ? কখনো কখনো কাউন্টারে ভাল লোকজন থাকে, বোঝে আমাদের সমস্যাটা, বিবেচনা করে এবং ছেড়ে দেয় ৫-৭ কিলো। কিন্তু কখনো কখনো এত কঠিন স্বভাবের সংস্পর্শে আসতে হয় যারা দু'কিলো বেশী ওজন ছাড়তে চায় না। এবার আমাকে এয়ার ফ্রান্স এর সে রকম এক মহিলার কাউন্টারে পড়তে হয়েছিলো। ব্যাগ থেকে প্রচুর জিনিষ বার করতে হলো। ভাগ্যিস আমার ছেলে আমার সঙ্গে ছিল, ওকে ফিরিয়ে দিলাম সব জিনিষ। রাগে, দুঃখে ফেটে পড়ছিলাম আমি, ভীষণ অসহায় বোধ করছিলাম। আবার দিল্লী থেকে কলকাতা যাবার পথেও সেই একই প্রশ্ন, কুড়ি কিলোর একটু বেশী ওজন হলে ছাড় পাবো তো ? শংকরদা সকালে আরো ভয় দেখালো। উনি ২/৩ দিন আগে কলকাতা থেকে দিল্লী এসেছেন এবং উনাকে চার কিলোর এক্সেস ব্যাগেজ দিতে হলো, শংকরদা বললেন, ''যা বেশী হবে দাম দিয়ে দেবেন, ভয় কি ? রিলাক্স থাকুন।'' আমি যে বন্ধুর বাড়ী এসেছি দিল্লীতে তারা দু'জনেই আমাকে আতঙ্কে ফেলল। দাদা ক্যাবিন ব্যাগেজটা তুলে বললেন, এটা তো বেশ ভারী, ধরবে তো বটেই। বৌদি জোর করে ৫০০ টাকা গুঁজে দিয়ে বলল, ''রেখে দাও, দরকার হতে পারে, সাবধানের মার নেই।''

যাই হোক একা ট্যাক্সি করে এয়ারপোর্ট এলাম। সোজা চলে গেলাম কাউন্টারে ব্যাগ মাপাতে। হাতের লাল ব্যাগটা অন্য একটা একটা কিডস্ ব্যাগ এ পুরে ওটা আমার গলায় ঝুলিয়ে নিলাম আমার হাত ব্যাগ হিসেবে। কেবিন ব্যাগটা টেনে টেনে নিয়ে গেলাম। খুব মিষ্টি হেসে কাউন্টার এর মেয়েটি ব্যাগটা মেপে আমাকে আরো দুটো ট্যাগ দিল হাত ব্যাগের জন্য এবং একটা ভাল সিট দিয়ে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে জানালার ধারে একটা বড় স্পেস ওয়ালা সিট দিয়েছে। আমি বললাম আমি খুব লাকী ! মিষ্টি হেসে মেয়েটি আমাকে উইস করল। এই একই আতঙ্কেও শিকার হতে হয় আমাদের শিল্পী ভাই-বোনদেরও। কলকাতা ছাড়ার আগে আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে, 'দিদি, আপনার জন্য কি আনবো এখান থেকে ?' এখানে তো এখন মোটামুটি সব জিনিষই পাওয়া যায় ভারতীয় দোকানগুলিতে, অবশ্যই প্যারিসে। আমি খুব চা খেতে ভালবাসি, ভাল দার্জিলিং বা আসামের চা। টি-ব্যাগ গরম জলে ফেলে সংক্ষেপে চা খেয়ে নেওয়ার আপোষে আমি নেই। তাই আমি আমার শিল্পী ভাই-বোনদের প্রশ্নের উত্তরে বলি, ''একটু ভাল দার্জিলিং চা আর কয়েক প্যাকেট ভাল ধুপকাঠি এনো।'' ওরা অবশ্য আরো অনেককিছু আনে বারন করা সত্ত্বেও, যার মধ্যে একটা হলো 'শাড়ী'। বিদেশে ওদের দীপাদি শুধুই শাড়ীই পড়ে, তাই হাতে করে একটা দামী শাড়ী আনে আমাকে খুশী করতে। ওরা যখন বিদেশে আসে তখন তো আত্মীয় বলতে ওদের 'দীপাদি'। কিন্তু যখন 'গানবাজনার' আসর চুকিয়ে বাড়ী ফিরবে তখন তো বাড়ীর লোকের জন্য, ছাত্রছাত্রী ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য ওদের কিছু ছোট উপহার নিতেই হবে। মাথায় হাত পড়ে যায় উপহার কিনতে গিয়ে। খুব হিসেব করে, দোকানে ঘুরে ঘুরে তো কেনা হলো। এবার সেগুলো ঠেঁসেঠুঁসে কোন রকমে স্যুটকেশ ভরাও হলো। কিন্তু ওজন-যন্ত্রে স্যুটকেশটা তুলেই চীৎকার করে ওঠে, ওজন তো কুড়ি কিলো পেরিয়ে গেছে, এখন উপায় ? কাঁধের ব্যাগে কিছুটা না হয় যাবে, কিন্তু ছাড়া পাবো কি জরিমানা দিয়ে ? সারারাত ধরে ওরা এই ব্যাগ থেকে জিনিষ ঐ ব্যাগ করবে, ঘুম তো তখন পালায়। সকালে তো 'দুর্গা' 'দুর্গা' করে বেড়োন হল। আমি ওদের সারা রাস্তা আশ্বাস দিই, চিন্তা করতে বারণ করি। ওদের জন্য সারা পথটা 'ঠাকুরকে' ডেকে ডেকে আমার তো গলা শুকিয়ে যায়। ওদের শুক্ল মুখটা দেখে আমার মনটা বিষন্ন আর ভারী হয়ে ওঠে। কাউন্টার এর কাছে আমি ওদের পাশে 'ভরসা' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি আর মাঝে মাঝে ঈশারা করে বলি, 'ঠাকুরকে ডাক'। ওরা তখন হাসে ! বলে, ''আপনার মত বিশ্বেস তো আমাদের নেই, ঠাকুর, আমাদের ডাক শুনবে না। আপনিই ডাকুন আমাদের জন্য।'' মালপত্তর জমা রেখে আবার হাসিমুখে ফিরে এসে বলে দীপাদি, আপনার ঠাকুর আপনার কথা শুনেছে। আমাকে প্রণাম করে হাসিমুখে, হাল্কা মেজাজে ওরা হাটতে থাকে নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে উড়োজাহাজ ধরতে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে। ওরা যখন বাড়ী ফেরার আনন্দে মশগুল আমি তখন আমার ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সারাপথ চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ী ফিরে আসি, ভাইবোনগুলো যেন মঙ্গলমত দেশে ফেরে এই প্রার্থনা করতে করতে।